দৈনিক সংবাদ
তারিখ 15 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

14

জীবনানন্দ দাশের কারুবাসনা

আহসানুল কবির

সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে উপন্যাসটিতে "সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতা" ও বেকারত্বে নিষ্পেষিত শোষিত জীবনের নিদারুণ ছবি ফুটে উঠেছে। (জ্ঞানান্বেষণ ও জাতির পুনর্জাগরণ : দীপিকা বসু)। "মিছে কেন কলকাতার ফোপর দালালি করতে যাও। তুমি মনে করেছ আমিই একা এম এ পাস করে বসে আছি—এমন আশি হাজার ছেলে তোমার মত বাংলাদেশের পথে-ঘাটে-ঘুরছে—একটা ছাগল সারাদিন চরে যে ঘাসটুকু পায় তাও জোটে না"। (কারুবাসনা)। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে জীবনানন্দ দাশ নীরবভাবেই আবিষ্করণ করেছেন সমসাময়িক কাল এবং পরিবেশকে। ইংরেজ অধ্যুষিত ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলার কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ নগর মুখীনতা। কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবন তখনকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে জীবন উত্তরণের বড় অবলম্বন বলেই মনে হয়েছিল। তাই যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে মানুষ এসে জড়ো হতে থাকে কলকাতাতে। কলকাতায় তখনকার সময়ের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র, ব্যবসাকেন্দ্র ও শাসনকেন্দ্র। ফলে এই নগরের উত্তাপ এবং সুযোগ থেকে কেউই বঞ্চিত হতে চায়নি, পারেনি। যারা সুযোগ পেয়েছে তারাই রাতারাতি বনে গেছে 'সাহেব'।

"তোমরা যে ভরণ-কাঁসার থালায় করে ভাত নাও, আমাদের ওখানে (কলকাতা) ত সে রেওয়াজ নেই, আমরা খাই ডিশে, ড্রেসডেন চায়নার ফুলকাটা ডিশ দেখিসনি? আমাদের চাকর বাকরও সেখানে (কলকাতা) থালায় খেতে চায় না।" (কারুবাসনা)। গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে কলকাতাতে যুবকরা জ্ঞানার্জন করতে এসে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিই বেশী মাত্রায় আকর্ষিত হয়ে পড়ে। কারণ, ইংরেজ এ দেশের ভাগ্যবিধাতা, তাদের ভাষা শিখলেই চাকরি লাভ সম্ভব। তারাই এ দেশে তাদের প্রয়োজনের জন্যে চাকরি-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল। যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরীক্ষা-কেন্দ্রিক বললেও ভুল হবে না। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আরো উপকৃত তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর হাতে বুর্জোয়ারূপ নেয়। "সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা নিজেদের সন্তানদের ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার যে গভীর বাসনা পোষণ করত তা পূরণের জন্য এই সময় একটি উপযুক্ত কলেজের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ইংরেজী ভাষার নাজারদর যত বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাদের এই আগ্রহও তত বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছিল।" (বৃটিশ ভারতের শিক্ষা-ষড়যন্ত্র : নিঃশঙ্ক গুপ্ত)। এই শ্রেণীর সাথেই প্রথম থেকে ইংরেজদের একটা সমঝোতা হয় ফলে এরা ইংরেজদের দালাল হিসেবে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকে। এরাই কালক্রমে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হয়। এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও একটি শ্রেণী (মধ্যবিত্ত) শিক্ষা- [illegible]

প্রকৃতপক্ষে বেশী সুবিধা করতে পারেনি। তাই এই শ্রেণী থেকেই বেশীমাত্রায় শিক্ষিত বেকার হয়। এই বেকারত্ব নিয়ে বিদেশী সরকারের তেমন মাথা ব্যথা ছিল না। শোষিত এবং শাসিত রাষ্ট্রের প্রতি শোষকশ্রেণীর কল্যাণবোধ থাকে কম। তাই শেষ পর্যন্ত এদেশে চাকরির পথ হয়ে পড়ে রুদ্ধ। তখন থেকেই বলতে গেলে এদেশের শিক্ষিত বেকাররা 'স্বদেশী' চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। অর্থাৎ বঞ্চিত চেতনা থেকেই রাজনৈতিক চেতনা লাভ। কিন্তু এই চেতনা সুবিধাবাদের শেকড় উপড়ে নির্ভেজাল রাজনৈতিক শক্তিতে দাঁড়াতে পারেনি বলেই ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভক্তের। এমন কথা উপন্যাসে স্পষ্ট করে বলা না হলেও নায়ক 'হেম' যে সন্ত্রাসবাদী ও স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'দু-তিনটি দেশপ্রেমিকের চিঠি আছে, লিখে সাহিত্যে নাম করেছে যারা কিংবা আজও সন্ত্রাস করে চলেছে তারাও আমাকে তাদের মধ্যে একজন ভেবে চিঠি লিখত।' (কারুবাসনা)। তবে নায়কের এ বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত বেকারত্ব আর দারিদ্রের ছোবলে নিশ্চিত ভাবে পরাজিত হয়েছে। কারণ, যে বয়সে একজন যুবক তার মনের স্বপ্নসাধ এবং কল্পনাকে বাস্তবতার উপর নির্বিঘ্নে দাঁড় করাতে চায় সেই বয়েসই উপন্যাসের নায়ক মুখোমুখি হয়েছে অনেক সমস্যার। এই সমস্যা বিশেষতঃ একজন পুরুষের, স্বামীর, পিতার, সন্তানের, শিল্পীর, সংগ্রামীর।

"সব-মিলিয়ে এক ঘন-হয়ে-আসা তমিস্রা, কোনো দিকে যেন কোনো আশার আলো নেই।" (সমাজ সংস্থা আশা-নিরাশা: অশোক মিত্র)। এত সবের মধ্যে নায়ক চরিত্র শুদ্ধ-চিন্তা এবং চেতনা দ্বারা নিজের ধৈর্যকে অনায়াসে ধরে রাখতে পারলেও পত্নী কল্যাণীর ও আড়াই বছরের মেয়ে খুকুরাণীর মুখের দিকে চেয়ে তাকে কলকাতা যাওয়া আসা করতে হয় একটি চাকরির জন্যে। কিন্তু "কলকাতায় একটা চামার মরলেও দু'শ' গ্রাজুয়েট দরখাস্ত নিয়ে ছুটে আসে।" (কারুবাসনা)। তবু যেতে হয়। নায়কের দাদা বেরিলিতে চাকরি করে। তার উপর ভরসা করেই তাকে কলকাতার একটি অখ্যাত মেসে থাকতে হয়। তবে প্রথম প্রথম দাদা তার প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল থেকেছে, কিন্তু এখন আর তেমনটি করে না। হেমের দুই কাকা সুরেশ এবং রমেশ বেশ বড় চাকরি করে তারা এখন কলকাতাতে নিজ বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিকভাবেই তারা এখন ভুলে গেছে গ্রাম এবং পারিবারিক ঐতিহ্যকে। সুরেশ কিছুদিনের জন্যে গ্রামের বাড়ীতে আসে, কিন্তু সে তার দাদাকে (নায়কের বাবা) খুব একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখে না কারণ, দাদা জীবনে বেশীদূর এগুতে পারেনি। কেবল গ্রামে পড়ে থেকেই জীবনটাকে ক্ষয় করে ফেলেছে। "দেশের বাড়িতে একাদিক্রমে সত্তর বছর কাটানো বড় কঠিন জিনিস একটু চুপ থেকে যাক কাটিয়ে দিয়েছি।" (নায়কের বাবার উক্তি কারুবাসনা)। পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা যারা সামান্য সুবিধার লোভে ভুলে যেতে পারে তাদের কাছে হাত পাতলেও লাভ হবে না জেনে নায়ক (হেম) কলকাতাতে তার কাকাদের বাড়ীতে উঠে না, দেখা করে না। কারুবাসনা নিয়ে যার চিন্তা তার পক্ষে কখনও চাকরির জন্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই কলকাতার কষ্টকর জীবন থেকে সে আবার ফিরে আসে বাড়ীতে। কলকাতার যান্ত্রিক জীবনের প্রতি তার ঘেন্না ধরে গেছে। গ্রাম তাকে টানে প্রকৃতির অপরূপ আকর্ষণ ছড়িয়ে আছে যেখানে, সেখানে তার শৈশব এবং যৌবনের অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে—তার কাছেই বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে। এ যেন সেই হাজার বছর ঘুরে ঘুরে বনলতা সেনের কাছে ফিরে আসা। এই বনলতা সেনই দিতে পারে শিল্পী মনের খোরাক এবং আনন্দ। 'যতই বয়স বাড়ছে এই আঁটচালা ঘরখানাকে ততই ভাল লাগছে আমার; চারদিকে এই আম-কাঠাল-লেবুর বন, জঙ্গল-মাঠ-নিস্তব্ধতা—বিশেষ করে এই আষাঢ় শ্রাবণের রাতে এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।" (কারুবাসনা)। বাবার সংসারে আসতে এবং থাকতে তার অসুবিধা হয় না। বাবা স্কুল মাষ্টার, আদর্শবান শিক্ষক। সন্তান হেমের (নায়ক) প্রতি তার বিরক্তি নেই। বরং উল্টোভাবে সে হেমকে লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ যোগায়। কিন্তু কল্যাণীর কাছে এ জীবন অর্থহীন, অসম্মানের, দুঃখের, কষ্টের। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে কাহিনী এবং চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব মূলতঃ এই রকমেরই। কাহিনী বিশ্লেষণে উপন্যাসটি পাঁচটি পর্যায়ভুক্ত—(ক) চরিত্রের ব্যক্তিজীবন, (খ) পারিবারিক জীবন, (গ) গ্রামীণ জীবন, (ঘ) নগর জীবন, (ঙ) সমাজ জীবন। এই সব জীবনের সমন্বয়ে কারুবাসনা উপন্যাসটি জীবনানন্দের এক অনন্য সৃষ্টি। উপন্যাসটির মূল চরিত্র এবং সহায়ক চরিত্রগুলো হচ্ছে—হেম (নায়ক), কল্যাণী (নায়িকা), বাবা (নায়কের), খুকু (মেয়ে), সুরেশ (কাকা), মা (নায়কের), যদুনাথ (বাবার বন্ধু), বিরাজ (বন্ধু), পিসিমা (নায়কের), অবিনাশ (বন্ধু)। উপন্যাসে নায়ক চরিত্র প্রায়সময় উত্তম পুরুষে কথা বলেছে। তার ব্যক্তি জীবনের সকল প্রকার ব্যর্থতার কথাগুলিই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। বাবা গ্রামীণ অর্থনীতির উপর থেকে

(৭-এর পাতায় দেখুন)